দারসে কুরআন সিরিজ-২৬

সূরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা

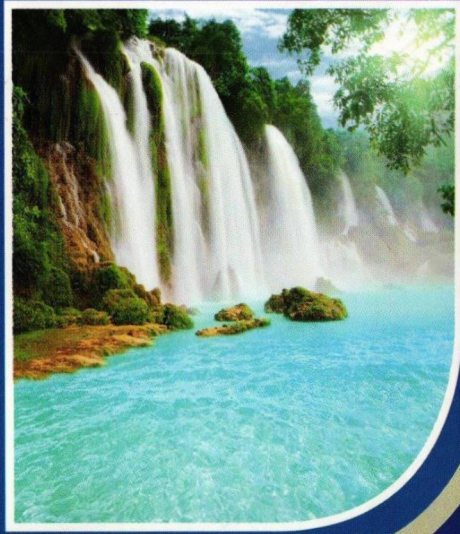

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-২৬

সূরা কাউসারের মৌলিক কথা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা কাউসারের মৌলিক কথা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯৩ ইং
বিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ২৬ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান?
- যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান
- যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন
- যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি
- নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটান
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ ۔

অনুবাদ

নিশ্চইয় আমি তোমাকে অত্যধিক দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার রবের নামে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপক্ষ তাদের লেজ কাটা বা তারা আটকুড়ে। তাদের কোন বংশ নেই বা তারা বংশহীন।

শব্দার্থ

اِنَّآ নিশ্চয় আমি اَعْطَيْنٰكَ আমি দান করেছি তোমাকে الْكَوْثَرَ অত্যধিক- فَ অতএব صَلِّ -তুমি সালাত আদায় কর বা নামাজ পড়। لِرَبِّكَ তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে وَانْحَرْ এবং কুরবাণী কর اِنَّ নিশ্চয়ই شَانِئَكَ তোমার প্রতিপক্ষ هُوَالْاَبْتَرُ তারাই বংশহীন।

শানে নুজুল

আল-কুরআনের প্রত্যেক সূরার এমন কি কোন কোন আয়াত বিশেষেরও পিছনে রয়েছে ইতিহাস- যাকে বলা হয় ঐতিহাসিক পটভূমি বা শানে নুজুল বা নাজিল হওয়ার মূল কারণ।

রাসূল (সাঃ) যখন কোন সমস্যায় পড়েছেন অথবা মনে কোন প্রশ্ন জেগেছে অথবা এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে পরিস্থিতি বা সমস্যার সমাধানের জন্যে বা মনের জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে হয় কোন পূর্ণাঙ্গ ছোট বা বড় সূরা অথবা কোন একটি আয়াত বা একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন। যে ঐতিহাসিক কারণে সূরা বা আয়াত নাজিল হয়েছে ঐ কারণকেই আমরা বলি শানে নুজুল।

এ সূরা কাউসারের পিছনেও রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ। এই ঐতিহাসিক কারণটা অহী আকারে নাজীল হয়না (অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নাজিল হওয়ার কারণটাও অহী আকারে নাজিল হয়ে থাকে।) অহী

www.pathagar.com

আকারে নাজিল হয় জওয়াব বা সমাধান। এ কারণেই শানে নুজুল না জেনে কোন আয়াত বা সূরার মূল ভাবার্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে–রাসূল (সাঃ)–এর মনের কোন প্রশ্নের জওয়াবে যদি কোন সূরা বা আয়াত নাজিল হয় তবে ঐ কারণ বা প্রশ্নটা কুরআন নয়। বরং তার জবাবে আল্লাহর নিকট থেকে হযরত জিব্রাইল (আঃ)–এর মাধ্যমে যা কিছু অহী আকারে নাজিল হয় সেটাই আল-কুরআন।

এ জন্যেই বলা চলে, আল-কুরআনের ভাষা হচ্ছে টেলিগ্রাফিক ভাষা। কাজেই তা বলা হয়েছে সংক্ষেপে। আর টেলিগ্রাফিক ভাষার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, যিনি টেলিগ্রাফ পাঠান তিনি জানেন তার মূল ভাবার্থ কি আর তিনিই জানেন যার কাছে টেলিগ্রাফ পাঠান হয়।

যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরে নিন, আপনার কোন নিজের লোক ঢাকায় চাকুরী করেন। আপনি তাকে অনুরোধ করে একটা চিঠি দিলেন যে, আমার ছেলে বি, এ, পাস করেছে। এখন তাকে আর পড়াতে পারছি না, আপনি মেহেরবাণী করে যদি তার জন্যে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, তবে আমার খুবই উপকার হতো। কোন চাকুরী বা টিউশনিই হোক যে কোন ভাবে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারলে আমাকে একটা টেলিগ্রাফ পাঠাবেন– আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেব। ধরে নিন আপনার ছেলের জন্যে যে কোন একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে ঐ ব্যক্তি খুব সংক্ষেপ ভাষায় টেলিগ্রাফ করলেন যে "ব্যবস্থা হয়েছে পাঠিয়ে দিন"। এখন বলুন শুধু এতটুকু কথার ব্যাখ্যা কোন বাংলা ভাষার পন্ডিত করে দিতে পারবেন কি? কেউই তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। এর ব্যাখ্যা তিনিই জানেন যিনি পাঠিয়েছেন এবং যার কাছে পাঠিয়েছেন।

কাজেই টেলিগ্রাফে ভাবার্থটা জানতে হলে তাঁরই কাছ থেকে জানতে হবে যার নিকট টেলিগ্রাফ পাঠান হয়েছিল। কারণ, একমাত্র তিনিই জানেন যে, এর আসল ভাবার্থ কি। এ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই শুধু টেলিগ্রাফের ভাষা থেকে তার ভাবার্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

যেমন ঐ লোকটার টেলিগ্রাফে লেখা কথাটা যে, "ব্যবস্থা হয়েছে পাঠিয়ে দিন" তার ভাবার্থ তিনিই বুঝেছিলেন যার নিকট খবর পাঠান হয়েছিল।

এখন বলুন ঐ টেলিগ্রাফের ভাষার মধ্যে কোথাও কি চাকুরীর কথা আছে? তা নেই।

www.pathagar.com

এইরূপ আল্লাহর কথার মধ্যেও এমন বহু কথা চিহ্নিত রয়েছে যার অর্থ একমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকেই আমরা পেতে পারি।

এ থেকে এটা স্পষ্ট করেই বুঝা গেল যে, আল্লাহর পাঠানো প্রত্যেক আয়াত বা সূরার পেছনে রয়েছে একটা ঐতিহাসিক কারণ, যেটাকে আমরা বলি শানে নুজুল বা ঐতিহাসিক পটভূমি।

ঠিক তেমনই এই ছোট্ট সূরা কাউসারেরও নাজিল হওয়ার পিছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক পটভূমি বা নাজিল হওয়ার কারণ। সে কারণটা হচ্ছে এই যে, রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ কয়েকটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন। যাদের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও এবং প্রথম পুত্রের নাম হযরত কাসেম (রা) কিন্তু পরবর্তী পুত্র সন্তান বা সন্তানগুলোর নাম নিয়ে খুব সামান্য কিছু মতভেদও আছে। সে যাই থাক-পুত্র সন্তানগণ সবাই ছোট অবস্থায় মারা যান, তাঁর একটিও ছেলে বড় হয়নি। এতে কোরেশ কাফেররা বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ এর (তাদের ভাষায়) যেহেতু কোন পুত্র সন্তান নেই তাই তার ধর্ম বেশী দিন টিকবে না। যে কয়দিন তিনি বেঁচে আছেন মাত্র ঐ কয়দিনই তার ধর্ম টিকবে। ঐ সময় রাসূল (সাঃ)-এর উপর নানা জুলুম অত্যাচার চলছিল, এরই মধ্যে শেষ পুত্র সন্তানটিও মারা গেলেন। তখন মনের দিক দিয়েও রাসূল (সাঃ) খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তখনই কোরেশ কাফেররা রাসূল (সাঃ)-এর নাম নিয়ে বলতে লাগল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবী ছিলেন, তাঁর ছেলে ছিল এবং তার বংশে একের পর এক বহু নবী হওয়ার সিলসিলা জারী ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নবীই হতেন তবে তাঁর ছেলেরা নবী না হলেও পিতার ধর্মকে পৈতৃক ধর্ম বা সম্পদ মনে করে পিতা যেভাবে জান-জীবন দিয়ে তার ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তেমনি পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে শুধু তারাই সেইরূপ জান-জীবন দিয়ে পিতার ধর্মকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু অন্যেরা কি এত কষ্ট করে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ধর্মকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে? তা অবশ্যই কেউ করবে না। আর আমাদের যেহেতু বহু পুত্র সন্তান আছে তাই তারা আমাদের ধর্মকে পৈতৃক ধর্ম হিসেবে টিকাবে-তা যে ভাবেই হোক না কেন।

তাদের এ কথায় রাসূল (সঃ) এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, ওদের এ কথাতো অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সত্যিই তো আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন। তারা থাকলে আমার ধর্মকে রক্ষার জন্যে যেমন জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করত, অন্যেরা কি তা করবে? এটা হলো রাসূলের মনের প্রশ্ন।

www.pathagar.com

আর ২ নং প্রশ্ন হলো এই যে কাফের মুশরিকদের বহু সন্তান সন্ততি রয়েছে তারা তো অবশ্যই তাদের পৈতৃক ধর্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা করবেই। এই দু'টি প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে সূরা কাউসার।

এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে "আমি অবশ্যই তোমাকে দান করেছি কাউসার বা "অত্যধিক"। এই কাউসার শব্দের ব্যাখ্যায় অনেকে এরূপ তাফসীর করেছেন যে, আল্লাহ রাসূলকে পুত্র সন্তানের পরিবর্তে হাউজে কাউসারের মালিক করে দিয়েছেন। ছেলের পরিবর্তে হাউজে কাউসারের মালিকানা পেয়ে যেন আল্লাহর নবী খুশী থাকেন। আর কোন কোন তাফসীরকারকের মতে কাউসার অর্থ আওলাদে কাসির। কাসির অর্থ বেশী আর কাউসার অর্থ অনেক বেশী। এখানে যারা আবে কাউসার অর্থ করেন তাদের একটা সঙ্গত যুক্তি হচ্ছে এই যে, কাউসার শব্দের পূর্বেই আছে আর কোন জিনিষকে নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্যে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর কিয়ামতের মাঠে যেখান থেকে পানি নিসৃত হবে সেটা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট স্থান তাই কাউসার শব্দের পূর্বে "আলিফ লাম" যোগ করা হয়েছে। কিন্তু আওলাদে কাসির কোন নির্দিষ্ট জিনিষ বা নির্দিষ্ট কোন ছেলে নয়, কাজেই এর অর্থ আওলাদে কাসির হলে এর পূর্বে "আলিফ লাম" আসলো কেন? এ প্রশ্নেরও সঙ্গত জওয়াব আছে। জওয়াব হচ্ছে এই যে, রাসূল (সাঃ)-এর একটা নির্দিষ্ট জামায়াত ছিল। যার নাম ছিল আল-জামায়াত। আর জামায়াতটা যেহেতু ছিল নির্দিষ্ট তাই এর পূর্বে "আলিফ লাম" বসেছে। ঠিক তেমনই যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আওলাদে কাসির বলা হয়েছে তারা সংখ্যায় যত বেশী হোক না কেন তারা আল-জামায়াতের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট দলের লোক। যে দলের মধ্যে কাফের মুশরিক বা কোন বদকার লোকের স্থান নেই। আওলাদে কাসিরের মধ্যে যারা গণ্য তারা সুনির্দিষ্ট একটা দল। যে দলের লোক কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়াতে আসতে থাকবে এবং রাসূল (সাঃ)-এর সেই রূহানী সন্তানেরাই দ্বীন ইসলামকে পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় মনে করবে এবং জান-জীবন দিয়ে হলেও তা রক্ষার জন্যে চেষ্টা করে যাবে।

এ প্রসঙ্গে অনেক মুফাস্‌সিরের মত হচ্ছে, রাসূল (সাঃ) যে আবে কাউসারের মালিক হবেন এটা তো পূর্ব থেকেই মুসলমানরা জানতো। তাই ইন্না আতাইনা কালকাউসার থেকে সম্ভবতঃ সেই কথাই বলে দেয়া হলো। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তা বোঝেননি। তিনি বুঝেছিলেন আওলাদে কাসির বা "অনেক সন্তান"। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন মুতাবিকই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

যেমন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার গাছে নাকি একটি আমও নেই? তার জওয়াবে যদি বলা হয় যে, কে বলে নেই বহু আছে। তাহলে এই "বহু" অর্থ "আম" কারণ প্রশ্ন ছিল আমের ব্যপারে। ঠিক তেমনই কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার জমিতে নাকি মোটেই ধান নেই। আর তার জবাবে যদি বলে যে বহুত আছে, তাহলে এই বহুতের অর্থ হবে ধান। কারণ প্রশ্ন ছিল ধানের ব্যপারে। আর যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার পুকুরে নাকি একটি মাছও নেই? আর জবাবে যদি বলা হয় "বহুত আছে"। তাহলে এখানে বহুত মানে হবে মাছ। আর যদি কাউকে জিজ্ঞেসা করা হয় যে, তোমার নাকি ছেলে মেয়ে কিছুই নাই। আর তার জবাবে যদি বলে যে, আল্লাহর ফজলে বহুত আছে। তাহলে এখানে বহুতের মানে হবে ছেলে মেয়ে তার আছে। ঠিক অদ্রূপ রাসূলের (সাঃ) মনে যখন প্রশ্ন জাগলো যে, আল্লাহ! কাফের মুশরিকরা যত কথা বলছে তার সবগুলোই অগ্রহণযোগ্য কিন্তু আমি এটা বুঁঝে উঠতে পারছি না যে, ওদের এ দাবীটা কি করে বেঠিক? প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য নবীগণের তো পুত্র সন্তান ছিল। আমাকেও তো তেমনই পুত্র সন্তান দিয়েছিলে। কিন্তু অন্য, নবী-রাসূলগণের পুত্র সন্তানগণ বড় হয়ে তাঁদের পিতার ধর্ম প্রচার করেছে। আমার ছেলেরা বড় হলে তারা যত গুরুত্ব দিয়ে আমার এই রক্ত ঝরান, দাঁত ভাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন যাপন করা ও হিজরাত করার মত কঠিন বিপদ মুসিবত সহ্য করে কত রক্ত ও কত শহীদানের লাশের উপরে কায়েম করা এই ইসলামকে যাকে আমি জীবনের চাইতেও বেশী ভালবাসি, তাকে অর্থাৎ এই কষ্টে গড়া ইসলামকে আমার ও আর সাহাবাগণের মত কষ্ট করে প্রয়োজন হলে অঢেল রক্ত দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করতো অন্যরা কি তা করবে? এটাও যেমন ছিল রাসূল (সাঃ)-এর মনের প্রশ্ন তেমন অন্যান্য দুশ্চিন্তাতেও যখন রাসূল (সাঃ) ছিলেন খুবই কতর, তখনই রাসূল (সাঃ) কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এবং তার মনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ বললেন আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বহুত দান করেছি। তাহলে এখানে "বহুতের" অর্থ কি হবে? যেখানে প্রশ্ন হয়েছে সন্তান সম্পর্কে সেখানে বহুতের অর্থ বহুত সন্তান হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই তাফসীরে ইবনে কাসিরে এ শব্দের অর্থ আওলাদে কাসির বা বহুত সন্তান দান করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটা আমার নিকটও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাই আমি আবে কাউসারের সঙ্গে এ ব্যাখ্যাটাও একই সাথে প্রযোজ্য বলে মনে করি। যেমন সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে যে মসজিদুল আকসার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ যেমন বাইতল মুকাদ্দাস এবং একই

www.pathagar.com

সঙ্গে বাইতুল মামুর। ঠিক তেমনই এখানেও এর অর্থ একই সঙ্গে আবে কাউসার এবং আওলাদে কাসির বা বহু সন্তান। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল যে অর্থে সন্তান চান সেই অর্থে আল্লাহ তাঁকে বহুত সন্তান দান করেছেন এবং করবেন, তারা রাসূল (সাঃ)-এর ঔরশজাত সন্তান না হলেও রূহানী সন্তান হিসাবে তাঁর দ্বীন ইসলামকে পৈতৃক সম্পদের ন্যায় মনে করেই জান-জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কথা থেকে তাইই বুঝেছিলেন বলে খুবই খুশী হয়েছিলেন। কারণ তিনি জীবনের চাইতেও ইসলামকে বেশী ভালবাসাতেন। মানুষ সাধারণতঃ কোন খুশীর খবর শুনলে কিছু শুকরিয়া আদায় করে। যেমন কেউ যদি খরব নিয়ে আসে যে, আমি তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে এসেছি তুমি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম হয়ে পাস করেছ। তাহলে এই খবর শুনে শুকরিয়া আদায় করে। ঠিক তেমনই আল্লাহও একটা খুশীর সংবাদ দিলেন বলে তার পরের আয়াতেই বললেন তুমি যখন খবর শুনে খুশী হলেই তখন শুকরিয়া আদায় স্বরূপ নামাজ পড় ও কুরবানী কর। তাতেই শুকরিয়া আদায় হবে। এরপর আর একটা প্রশ্নের উত্তর বাকী রইল। কাফের মুশরিকদের যে বহুত ছেলে রয়েছে ওরা কি ওদের বাপ দাদার ধর্ম টিকিয়ে রাখতে পারবে? রাসূলের মনের এ প্রশ্নের জবাবে বলা হলো তোমার প্রতি পক্ষই নিঃসন্তান। কারণ যে অর্থে তারা সন্তানের দাবী করছে সেই অর্থে ঐ সন্তানেরা কিছুই করতে পারবেনা। অর্থাৎ ওদের শিরেকী ধর্ম ওরা টিকিয়ে রাখতে পারবে না। এ খবর শুনে আল্লাহর নবী আরো খুশী হলেন।

এখন প্রশ্ন, রাসূল (সাঃ) কে তো আল্লাহর পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কেন আল্লাহ শিশুকালেই নিয়ে গেলেন? অন্যান্য নবীগণের তো পূত্র সন্তান ছিল, তারা বড় হয়েছিলেন কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর পুত্র সন্তান কেন বড় হলো না।

এর মূল কারণ হলো এই যে, রাসূল (সাঃ) যেহেতু শেষ নবী ছিলেন তাই তার কোন সন্তান থাকা–আল্লাহর দৃষ্টিতে উচিৎ ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁকে সন্তান দিয়েও তা নিয়ে নিলেন। উচিৎ ছিল না এই জন্যে যে, ছেলে বড় হয়ে তিন প্রকার হতে পারে। যথা

১। পিতার চাইতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন। এই ধরণের সন্তানদের সাধারণতঃ পিতার কুপুত্র বলা হয়।

২। পিতার সম যোগ্যতা সম্পন্ন। এই সব ছেলেদের বলা হয় "যেমন বাপ তেমন ছেলে"।

www.pathagar.com

৩। পিতার চাইতে উচ্চ বা অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হলে সেই ছেলেদের বলা হয় পিতার সুপুত্র।

রাসূলের (সাঃ) সন্তান বড় হলে এই তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকারের হতেন। যদি পিতার চাইতে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতেন তাহলে তো হুজুর (সাঃ)-এর চাইতে তার পুত্রের যোগ্যতা বেশী হওয়ার কারণে তাঁকেই শেষ নবী করা লাগতো। রাসূল (সাঃ) তো ছেলের চাইতে কম যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে শেষ নবী হতে পারতেন না।

আর পিতার সম-যোগ্যতাসম্পন্ন হলে রাসূল (সাঃ)-এর ন্যায় তাঁকেও রাসূল করা লাগতো এবং তার উপরও কুরআন নাজিল করা লাগতো। নইলে সমান তো হয় না।

আর যদি পিতার চাইতে নিম্ন হতেন তাহলে যতই কম যোগ্যতা থাক না কেন রাসূল (সাঃ)-এর পরে তাঁর সন্তান থাকলে তাকেই মানুষ গদিনশীন বানিয়ে নিত। ফলে রাজতন্ত্র ইসলামে বৈধ হয়ে যেত। যেমন বর্তমানে কোন পীর সাহেবের ছেলে অযোগ্য হলেও তাকেই গদিনশীন করা হয়।

এই সব কারণ আল্লাহর সামনে ছিল বলেই তার কোন ছেলেকেই আল্লাহ বড় করেননি। ছোটকালেই নিয়ে নিয়েছেন। ফলে ইসলাম রাজতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে।

এর পর প্রশ্ন, আল্লাহ যখন পূর্ব থেকেই জানেন যে, কোন ছেলেকেই বড় করবেন না, তবে না দিলেই হতো দিলেন কেন? এর জওয়াব হচ্ছে এই যে–আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে করছেন "উস্ওয়াতুন হাছানা" বা উত্তম আদর্শ। কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদেরও তো অনেকের একাধিক পুত্র সন্তান হয় কিন্তু একটা ছেলেও বেঁচে থাকে না। এই অবস্থায় কিভাবে ছবর করতে হবে সে শিক্ষাও নিতে হবে রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী থেকে। কাজেই রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহ সন্তান দিয়ে তা নিয়ে নেয়ার পর তিনি যেভাবে ছবর বা ধৈর্য্য ধারণ করেছেন ঠিক সেই ভাবে আমাদেরকেও ছবর বা ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পুত্র দিলেন এবং তা শিশুকালেই নিয়ে নিলেন। এ থেকে আমাদের জন্যে শিক্ষা হলো এই যে, আল্লাহ যদি আমাদেরকেও ঐরূপ পুত্র সন্তানই হোক বা কন্যা সন্তানই হোক–যদি দিয়ে তা শিশু কালেই নিয়ে নেন তবে আমরত্তা বে–ছবর হবে না, এছাড়াও যাদের ছোট সন্তান মারা যায় তারা মুসলমান হলে কিয়ামতের দিন তারা একটা অতিরিক্ত ফায়দা লাভ করবে। তা হচ্ছে ঐ শিশুছেলে–মেয়েরা কিয়ামতের

www.pathagar.com

সেই ভীষণ কঠিন দিনে যেদিন মানুষ পিপাসায় ছটফট করবে তখন তারা যারা বাচ্চা অবস্থায় মারা গিয়েছিল তাদের মা বাপকে খোঁজ করে পানি পান করাবে। আর ঐ শিশুরা হবে একেবারেই নিষ্পাপ কাজেই তারা তাদের মা-বাপকে যতটুকু সাহায্য করতে পারবে কিয়ামতে তত বেশী সাহায্য আর কোন বুজর্গ ব্যক্তির দ্বারা হবে না। কাজেই আমাদের কোন বাচ্চা সন্তান মারা গেলে কখনো বে–ছবর হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের উচিৎ ঠিক রাসূল (সাঃ)-এর ন্যায় ছবর করা।

আশারায়ে মোবাশাশারীনদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত তালহা (রাঃ) এই ধরণের ছবরের কারণে বেহেশতের সুংবাদ পেয়েছিলেন।

আল্লাহ তার বহু বান্দাকেই এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকেন। আল্লাহ পাক আমাকেও এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। যেটা ছিল আমার প্রথম পুত্র সন্তান। আমি আশায় মন ভরে তার নাম রেখেছিলাম হাবিবুল্লাহ বা আল্লাহ দোস্ত। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাকে দোস্ত হিসেবে কবুল করার জন্যেই একেবারেই বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে নেন। জানিনা এই পরীক্ষায় আল্লাহ আমাকে পাস নাম্বার না ফেল নাম্বার দিয়েছেন। তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমি যে পাস করারই চেষ্টা করে ছিলাম তা আল্লাহ ছাড়া আর কারুরই জানার কথা নয়। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমার একটা সন্তানও যদি বেহেশতী হয় তবে সে হলো আমার বড় পুত্র হাবিবুল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের প্রত্যেককে ছবরে ক্ষমতা দাও এবং আমাদের মা-বাপদের কাছ থেকে তোমার নামটা প্রথমে শিখেছি যে, তোমার নাম আল্লাহ, সেই মা–বাপকে যে সব সন্তানদের কষ্ট করে লালন-পালন করে তোমারই দেয়া দায়িত্ব পালন করেছি তাদেরকে এবং আমাকেও তোমার মেহেরবাণীর ছায়াতলে স্থান দিও এবং আমাদের গোনাহ যতই বেশী হোক না কেন তোমার রহমত তার চাইতে বহুত বহুত বেশী। এটা যে বিশ্বাস করি এই ঈমান টুকুর কারণে আমাকে, আমার আওলাদ, আত্মীয়-স্বজন কাউকেই আল্লাহ তুমি মেহেরবাণী করে পরকালে কাঁদাইও না, বা কষ্ট দিও না।

আর যারাই তোমাকে বিশ্বাস করে এবং যারাই একমাত্র মুসলমান হওয়ার, থাকার ও থাকতে চাওয়ার কারণে মার খাচ্ছে এবং যারাই তোমার দ্বীনকে তোমার জমিনে কায়েম করার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং বহুজন শহীদও হচ্ছে আল্লাহ তুমি মেহেরবাণী করে তাদের হাজারো অপরাধ মাফ

www.pathagar.com

করে দিও। আল্লাহ এই দুনিয়ার জীবনে যাদের সঙ্গে থেকে জীবন-যাপন করছি এবং যাদের সঙ্গে মিলে-মিশে এ দুনিয়ায় তোমার দ্বীনকে তোমার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার দলে দলভূক্ত হয়েছি, আল্লাহ আমাকে পরকালে তাদের মধ্যে শামিল থাকার সৌভাগ্য দান কর। আল্লাহ তোমার দয়ার উপরই আমাদের একমাত্র ভরসা। আল্লাহ তুমি আমাদের কাউকেই মেহেরবাণী করে কাঁদাইও না। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলের রূহানী সন্তানের দলভূক্ত কর এবং সেই মুতাবিক কাজ করেই ঈমানের সাথে আমরা সবাই যেন তোমার দরবারে হাজির হতে পারি, আল্লাহ তার যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমারই উপর অর্পণ করলাম। এই অর্পণটাকে আল্লাহ তুমি কবুল করে লও। আল্লাহ আমরা কখনই তোমার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ নই, এইটুকুই আমাদের একমাত্র সম্বল।

এরপর প্রশ্ন হলো এটাতো রাসূলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু তা আল-কুরআনে কেন স্থান পেল? এর আংশিক জবাব তো হয়েই গেছে। কিন্তু এর একটি মূখ্য জবাবও আছে যা আমাদের জন্যে এক বড় শিক্ষণীয় বিষয়, আমরা যদি সঠিকভাবে অনুধাবণ করতে পারি তাহলেই পরকালে নিশ্চিত মুক্তি পাওয়া যাবে এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।

সে শিক্ষাটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই তার কিছু বান্দাদের দ্বারা রাসূল (সাঃ)–এর রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করাবেন। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্যে যেমনভাবে জান-জীবন দিয়ে কাজ করেছেন এবং এর জন্যে তার পুরা জিন্দেগীতে–

কখনোও না খেয়ে কষ্ট করেছেন, কখনোও মার খেয়ে বেহুশ হয়েছেন, কখনোও মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছেন কখনোও নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন, কখনোও গাছের পাতা ও ছাল খেয়ে জীবন জীবন ধারণ করেছেন, কখনো উটের চামড়া ছোট টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। কখনো পিতা-মাতার ভিটে মাটি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। কখনো গরীবের সাহায্যের জন্যে নিজের সব কিছুই বিলিয়ে দিয়েছেন, কখনোও যুদ্ধ করেছেন, গায়ের রক্ত ঝরিয়েছেন, দাঁত ভেঙ্গেছেন। এক যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নেয়ার পূর্বেই অন্য যুদ্ধের জন্যে বেরীয়ে পড়েছেন। কখনো গরীব অসহায় সর্বহারা, এতিম নওমুসলিম বিধবা ও উপার্জনের অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্যে অস্থির হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের খাওয়া পরা, তাদের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের

www.pathagar.com

পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কখনোও গরীবদের চিন্তায় রাতের পর রাত জেগে বিভোর হয়ে থেকেছেন। কখনোও গরীব মায়ের সন্তানদের জন্য খাদ্যের অভাবে (যাদের স্তনের দুধ ছিলনা) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বকরির দুধ চেয়ে এনেছেন এবং তাদের বাড়ি গিয়ে সেই দুধ পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও অসহায় দুঃস্থদের জন্যে বাড়ি বাড়ি থেকে রুটি, তরকারী ইত্যাদি চেয়ে এনে তাদের খেতে দিয়েছেন। এভাবে সারাটা জীবন তিনি পরের উপকারের জন্যে নিজের জীবনকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার চরিত্র সংশোধনের জন্যে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

এসবের মধ্যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে কায়েম করা। অর্থাৎ কুরআনে যা আছে তাই থাকবে সমাজের চিত্র। এ জন্যে তিনি অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য একটাই যে বনি আদমকে ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্যে একটা খোদায়ী সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর জমিনে কায়েম করা। তিনি জীবনে কোনদিন দুনিয়ার সুখ-শান্তির চিন্তা করেননি।

ভাল একটা জাঁকজমকপূর্ণ ঘরে বাস করেননি। কোন দিন ভাল খাওয়া, ভাল পরার চেষ্টাও করেননি এবং কোন দিন এসবের চিন্তা ও করেননি। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাশিতার চিন্তাও কোন দিন করেননি। তাঁর চিন্তাকে সব সময় নিয়োজিত রাখতেন বনি-আদমের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও শান্তির ব্যবস্থা করার কাজে।

এটাই ছিল তাঁর স্বভাব। আমরা কিছু লোক তার রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করবো বলেই আল্লাহ তার রাসূলকে সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ঠিক তোমার মতো চিন্তা ও কাজ করার জন্যে তোমাকে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সন্তান দিতেই থাকবো। যে সংবাদে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খুশী হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন, আমরা কে কে রাসূলের এই রূহনী সন্তানের অন্তর্ভূক্ত থাকতে চাই এবং সত্যই কি তা চাই? চাইলে কি তার প্রমাণ দিতে হবে না? নাকি রাসূল (সাঃ)-এর এই রূহানী সন্তানদের তালিকার বাইরে থাকতে চাই?

এ সব চিন্তা থেকে আমাদের মস্তিষ্ক কখনও যেন খালি না থাকে অর্থাৎ সর্বদাই যেন রাসূলের রূহানী সন্তানের মধ্যে শামিল থাকতে পারি, তা যেন সর্বদাই আমাদের মাথায় থাকে এই জন্যেই এটাকে কুরআন পাকের একটা

www.pathagar.com

সূরা করা হয়েছে এবং এমন একটা ছোট সূরার মধ্যে এই শিক্ষাটা তুলে ধরা হয়েছে যে, ছোট সূরা হিসেবে এটাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলের উম্মতগণ বেশী বেশী পড়বে। আর যত পড়বে ততোবার তাদের মনে পড়বে যে, আমাকে তো এই সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এ দায়িত্বই হবে আমার জীবনের মূল দায়িত্ব। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) যেমন খেয়ে না খেয়ে, প্রয়োজনবোধে হিজরত করে, দেহ মুবারক থেকে রক্ত ঝরিয়েও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় নিজেকে সর্বদা মগ্ন রাখতেন, তাঁর যেমন চিন্তা ছিল সব শ্রেণীর লোকই যেন সম মর্যাদায় এ পৃথিবীতে বাস করতে পারে কেউ হবে কোটিপতি আর কেউ হবে বস্তিবাসী, কেউ থাকবে সাত তলায় আর কেউ থাকবে গাছ তলায়, কেউ হবে চাকর আর কেউ হবে মুনিব, এমন যেন না হয়। এখানে একটা সমাজ গড়াই ছিল তাঁর সারা জীবনের চিন্তা ভাবনা। আমাদের সারা জীবনের কাজ-কর্ম এবং চিন্তা-ভাবনা যেন সে মুতাবিকই হয়।

পরবর্তী প্রশ্ন, আমরা যারা এই রূহানী সন্তান হতে চাই তাদের চিন্তা করতে হবে যেঃ–

যেমন আমাদের পিতার জীবদ্দশায় তিনি যে জমির খাজনা দিতেন, পিতার অবর্তমানে ঐ জমির খাজনা আমরাই দিই এবং ঐ জমিকে আমরাই আবাদ করি। আর জমির ফসল যখন অন্যের গরু–ছাগল নষ্ট করতে চায় তখন সে ফসলের হেফাজত আমরাই করি। কারণ পিতার অবর্তমানে সে জমির মালিকও যেমন আমার তেমন তার হেফাজত করার দায়িত্ব আমাদের। আবার সে জমির ফসলও আমাদেরই পাওনা। ঠিক তদ্রূপ আমাদের নবী (সাঃ) যে সম্পদের মালিক ছিলেন তা হলো দ্বীন ইসলাম। এই সম্পদকে তিনি ঠিক যে ভাবে কায়েম করেছেন এবং সংরক্ষণ বা হেফাজত করেছেন । আমরা তাঁর রূহানী সন্তান হলে আমাদেরকেও ঠিক সেই একই পথে একই পন্থায় দ্বীন ইসলামকে হেফাজত করতে হবে।

মনে করুন, আপনার পিতার জমির মালিক এখন আপনি। সেই জমিতে এখন পাকা ধান। আপনার অগোচরে সেই ধান কেউ চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে আপনি খবর পেলেন। তখন কি আপনি খবরটা শুনে চুপ চাপ বসে থাকবেন, না কি তাকে (চোরকে) ধরে তার কাছ থেকে সেই ধান উদ্ধারের চেষ্টা করবেন? চেষ্টাতো অবশ্যই করবেন। কিন্তু এরূপ খবর শুনে অবশ্যই বসে থাকবেন না এবং তা থাকতে পারবেনও না। সেই ধান

www.pathagar.com

উদ্ধার করতে গেলে চোর ডাকাতদের হাতে আপনি যদি মারও খান তবুও আপনাকে ধান উদ্ধার করার কাজ থেকে কেউ ফিরাতে পারবে না। আর আপনার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জায়গা জমি যদি কেউ জবরদখল করতে আসে তাহলে জীবন দিবেন কিন্তু জমি বেদখল হতে দিবেন না। সাধারণতঃ এটাই হয়ে থাকে সন্তানদের স্বভাব।

এখন বলুন, আপনার রূহানী পিতার সম্পদ দ্বীন ইসলাম শয়তান নামের কোন শক্তি বা শয়তানী স্বভাবের কেউ যদি দখল করতে আসে তাহলে আপনি যদি সত্যিই রাসূলের রূহানী সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে কি দ্বীন ইসলামের উপর আঘাত আসলে চুপ-চাপ থাকতে পারেন? না কি জীবন থাকবে কি যাবে সে চিন্তা বাদ দিয়েই আঘাত প্রতিরোধ করবেন।

আমি আরো একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধরে নিন, আপনার কোন জমির ধান অন্যের গরুতে খাচ্ছে। এ খবর একজন আপনাকে দিল। যে খবর দিল সেই আগে দেখল যে, আপনার জমির ধান অন্যের গরুতে খেয়ে নষ্ট করছে কিন্তু সে ঐ গরুটাকে তাড়াতে গেল না। সে শুধু মাত্র খবরটা আপনাকে পৌঁছে দিল। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই গরুটা তাড়াতে যাবেন। এমনকি আপনি অত্যন্ত ক্ষুধার সময় মাত্র খেতে বসেছেন তখনও যদি খবরটা শুনতে পান তাহলে ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও খাবার ফেলে গরু তাড়াতে যাবেন। কেন যাবেন? এই জন্যে যে এ ফসলের মালিক আপনি নিজেই। কাজেই তার ফসল কোন গরুতে নষ্ট করলে তা দেখার দায়িত্ব অন্যের নয়, আপনারই। ঠিক তেমনই যে (জমির ন্যায়) দ্বীন ইসলামের পুরো দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করেছেন তার হেফাজতের দায়িত্ব একজন কম্যুনিষ্টের নয়, বা কোন সমাজতন্ত্রীর নয় বা কোন ধর্মনিরপেক্ষবাদীর নয়, বা কোন কাফের-মুশরিক বা কোন মুরতাদেরও নয় তার পুরো দায়-দায়িত্ব আপনাদেরই, যারা রাসূল (সাঃ) রূহানী সন্তানের মধ্যে শামিল হতে চান।

কিন্তু যদি একদিকে দাবী করেন আমি রাসূলের সেই খাঁটি উম্মতের বা তার রূহানী সন্তানের অন্তর্ভূক্ত। আর আপরদিকে যখন দেখেন যে, রাসূলের সব সম্পদই এক এক করে লুট-পাট হয়ে যাচ্ছে অথচ আপনি শুধু দেখছেন এবং নীরবে তা সহ্য করে যাচ্ছেন। আর মনে মনে ভাবছেন যাক না কিছু সব তো আর যাচ্ছে না। যেটুক থাকে তাই নিয়েই খুশী থাকব। যেমন ধরুণ, আপনার পিতার সম্পদের মধ্যে ছিল নিম্নের আইন-কানুনগুলো যা শয়তান বাতিল করে দিল। তা হচ্ছে যথাক্রমেঃ–

www.pathagar.com

১। জাতীয় সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা। সেটা আপনার শত্রু শয়তান বাতিল করে দিল।

২। চোরের হাত কাটা, ডাকাতের এক পাশের হাত ও অন্য পাশের পা কেটে দেয়ার আইন, সেটা শয়তান বাতিল করল।

৩। সুদ–ঘুষ–জুয়া, মদ–মাতলামি, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি ডাকাতি হাইজ্যাক, মানুষ চুরি ছেলে চুরি, অপহরণ, ধর্ষণ, খুন–খারাবী, রাহাজানি ইত্যাদি যা আপনার পিতার জমিতে কখনও আবাদ হতে পারেনি। আপনার পিতার জমি শয়তান দখল করে সেখানে এ সবের আবাদ শুরু করে দিয়েছে আর আপনি তা দেখেও মনে মনে ভাবছেন, যাক না কিছু বেদখল হয়ে, এখনও তো পিতার সম্পদের অনেক কিছুই রয়েছে। যেমনঃ-

☆ এখনো মসজিদে নামায পড়া যায়,

☆ পীরের ছেলে হয়ে গদিনশীন পীর হওয়া যায়।

☆ মিলাদ পড়া, কেউ মরে গেলে তার জানাজা পড়া, খতম পড়ে ছওয়াব রেছানী করা যায়।

☆ ওয়াজ নসিহত করে পীর মুরিদী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়,

☆ টাকা থাকলে হজ্জ করা যায়।

☆ পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে কুরআনের বিধান মুতাবিক তাঁদের সম্পদের মালিক হওয়া যায়।

☆ মুসলমানি করা যায়।

☆ গরুর গোস্ত খাওয়া যায়।

☆ বুড়োকালে দাঁড়ি রাখা যায়, টুপি মাথায় দেয়া যায়। (অবশ্য জওয়ানকালে দাঁড়ি রাখলে যদিও আদর্শবাদী সন্দেহে মার খাওয়ার ভয় আছে কিন্তু বুড়ো কালে এমন ভয় নেই।)

☆ এমনকি ইসলামের কালেমার জিকির করা যায়।

☆ এ কালেমা পড়ে গরীবেরা ভিক্ষাও করতে পারে।

কাজেই ইসলামের এত কিছু যখন রয়েছে তখন ইবলিসের মানসপুত্ররা যদি কিছু নষ্টও করে ফেলে তবে ইসলামের এমন কিই বা আর ক্ষতি হবে। যেটুকু আছে এতটুকু নিয়েই যদি আমরা খুশী থাকি তবুওতো কেয়ামতে আল্লাহর কাছে বলতে পারব যে, পিতার যে সম্পদ রক্ষা করতে গলে মার খাওয়ার ভয় ছিল সেটা রক্ষা করার ধারে কাছে না গেলেও যেটা কেউ বেদখল করতে আসেনি সেটার তো হেফাজত করেছি। এতে কি

www.pathagar.com

রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করা হয়নি? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কি জওয়াব পাওয়া যাবে এবং রাসূল (সাঃ) কি বলবেন তা কি আরো ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে? আমিতো মনে করি এর আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানদের পরকালে কি মর্যাদা হবে এবং দুনিয়াতে তাদের ভূমিকা কি হবে তা কিছুটা বলা দরকার মনে করি।

সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ বলেছেন– (১০ থেকে ১৪ আয়াত)

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۔ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ
ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۔ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো অগ্রবর্তীই। তারাই তো সান্নিধ্য লাভকারী লোক। তারাইতো নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে বাস করবে। তারা আগেরকালের লোকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হবে। আর পরের কালের লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক হবে।

এখানে وَالسّٰبِقُوْنَ শব্দ দ্বারা অগ্রবর্তীদের কথা বলা হয়েছে এবং اَلْمُقَرَّبُوْنَ শব্দ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের বুঝানো হয়েছে। এ ক'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যারাই রাসূল (সাঃ) এর ছেড়ে যাওয়া কাজকে নিজের কাজ মনে করবে যেমন পিতার মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা পিতার রেখে যাওয়া কাজকে নিজের কাজ মনে করে।

অর্থাৎ পিতার সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণে তার সন্তানের একমাত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঠিক তেমনই রাসূল (সাঃ) এর রেখে যাওয়া একমাত্র সম্পদ হচ্ছে দ্বীন ইসলাম এই দ্বীনকে সমাজে কায়েম করতে গিয়ে হুজুর (সাঃ) ২৩ বছর একটানা সংগ্রাম করে তিনি একটা ইসলামী খেলাফত কায়েম করে গিয়েছেন। সেই খেলাফতকে রক্ষা করা ও টিকিয়ে রাখাও তার রূহানী সন্তানদের দায়িত্ব। আর পিতার সম্পদ বেদখল হয়ে গেলে পুনরুদ্ধার করাও তাঁর রূহানী সন্তানদেরই দায়িত্ব। যারা এ দায়িত্ব পালনে অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করবে তারাই কেয়ামতের দিন সামনের কাতারে নবী-রাসূলগণের সঙ্গে থকবে। বেহেশ্‌তেও থাকবে তারা নবী-রাসূলগণের সঙ্গে। তারাই হবে والسبقون বা অগ্রবতী ভূমিকা পালনকারী।

www.pathagar.com

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, কোন ভাল কাজ করার জন্যে প্রথমে কারো মাথায় প্রথম চিন্তা হয় যে, এই ভাল কাজটা করা দরকার। যেমন ধরুনঃ-

১। আল্লামা ইকবালের মাথায় প্রথম ধরা পড়ল যে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা যা তারা হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরায় সৃষ্টি করা দরকার। তিনি তা করার জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করলেন।

(২) মাওঃ মোহাম্মাদ আলী, মাওঃ শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এদের মাথায় চিন্তা জাগল যে, মুসলমানদেরকে পরাধীনতা থেকে স্বাধীন করা দরকার।

(৩) আল্লামা মওদূদী (রাঃ)-এর মাথায় চিন্তা হলো সারা বিশ্বে ইসলামের পূর্ণজাগরণ সৃষ্টি করা দরকার। আর ইসলামের যে বুঝ মানুষের মগজে নাই তা ঢুকানো দরকার। তিনি এই চিন্তাকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে চেষ্টা করে গেছেন।

এসব হলো বড়ধরনের ভাল কাজের চিন্তা–ভাবনা। আর ছোট খাট যার যেমন যোগ্যতা আছে তার মাথায় তেমন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের চিন্তা প্রথমে উদয় হয়, তার পরে তারা তাদের সহযোগী খোঁজ করেন। এভাবে এখলাছের সাথে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার কাজে শরীক হওয়াকে যারা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন এবং যারা ইসলামের কোন কাজকে অন্যের কাজ মনে করেননা নিজের কাজ বা নিজের দায়িত্ব মনে করেন তারাই হচ্ছেন কেয়ামতের দিন আগের কাতারে থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। যাদেরকে বলা হয়েছে اَلسّٰبِقُوْنَ ধরুন, পিতার সম্পদ যদি কোন শক্তিধর লোক বেদখল করে রাখে আর আপনি পিতার যোগ্যসন্তান হন তাহলে আপনাকে কারো বলে দেয়া লাগবে না যে, তোমার পিতার সম্পদ যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে তা তুমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর। বরং আপনার অনুভূতি থাকলে আপনার মনই বলবে যে, পিতার সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধার করতেই হবে। এতে প্রয়োজন হলে আপনার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপনি যুদ্ধেও লিপ্ত হতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার জীবনটাও চলে যেতে পারে তবুও আপনাকে সেই যুদ্ধ থেকে কেউ ফিরাতে পারবে না। পিতার সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাদের এই জীবনেই কত যে বনি-আদমকে প্রাণ দিতে দেখিছি তার কোন

www.pathagar.com

হিসেব-নিকেশ নেই। ঠিক তেমনই যারা রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে আগ্রহী তাদেরও বহুজনকে দেখেছি এবং দেখছি যে তারা নির্দ্বিধায় মহামূল্যবান জীবনটা বিলিয়ে দিচ্ছেন। কেউবা হাত-পা ভেঙ্গে খোঁড়া হয়ে জীবন যাপন করছেন, কতজন তার যুবতী স্ত্রীকে বিধবা করে সন্তান সন্ততিদেরকে এতিম করে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্যেই অকাতরে জীবনটাকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। এরাই যে প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন জাতে সন্দেহের নাম মাত্রও নেই।

আবার অনেকে অন্যভাবে দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন যেমন কারো মাথায় চিন্তা হয় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের। কারো মাথায় চিন্তা হয় অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের। কারো মাথায় চিন্তা হয় আল্লাহ ভাষায় মুস্তাদআফীনদের বা নিরীহ গরীব অসহায়দের পূর্ণবাসনের। কারো বা মনে চিন্তা হয় ইসলামের কোন না কোন দিক সম্পর্কে কাজ করতে যেন মুসলমান তাদের হারানো সম্পদ পুনরায় ফিরে পেতে পারে। এ জন্যে যারাই অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তারাই হচ্ছেন সত্যিকার অর্থে অগ্রবর্তী। কাজেই আল্লাহ বলেন, দ্বীনের কাজে জীবনভর যে অগ্রবর্তী থাকবে সে তো পরকালেও অগ্রবর্তীদের মধ্যেই গণ্য হবে।

এ ছাড়াও সূরা কাউসার আমরা যতবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবো ততো বারই যেন মনের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, আমাকে কেয়ামতের দিন সেই দল ভূক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেন আল্লাহর সামনে গিয়ে বলতে পারি যে, হে আল্লাহ! যে কথা বলে তোমার রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দিয়েছিলে, হে নবী! তোমার সন্তানের কাজ করার মত লোক আমি দুনিয়ায় যুগে যুগে পাঠাতে থাকব, আমি তার একজন ছিলাম এবং সে জন্যে আমার জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

সূরা কাউসার থেকে আমাদের মনে কি এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে? এবং সেই অনুভূতি কি আমাদের দ্বীনের কাজে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনের শিক্ষা দেবে? আর আমরা কি সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জান-জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর নবীর প্রাণপ্রিয় ইসলামকে আল্লাহর জমিনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের কাজকে আপন কাজ মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো? তা যদি পারি তবে সূরা কাউসার পড়া আমাদের জন্যে সার্থক হবে, নইলে নয়। আশাকরি এ অনুভূতি আমাদের মাথায় সর্বদাই জাগ্রত থাকবে।

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন–১

রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালক করতে হলে সর্বপ্রথম সেই কথা স্মরণ করতে হবে, যে কথা বলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাঃ) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সে কথাগুলো নিম্নে দেয়া হলো।

অবশ্য হাদীসের অনেকগুলো সহীহ্ বর্ণনা মতে সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নাজিল হওয়ার পর কিছু সময় আয়াত নাজিল বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকার অর্থ হলো রাসূল (সাঃ) -এর মনের প্রস্তুতির জন্যে কিছু সময় দেয়া মাত্র। এরপর হঠাৎ একদিন উপর থেকে একটা আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তারপর উপর দিকে চেয়ে সেই ফেরেস্তাকেই দেখতে পেলেন যিনি হেরা গুহায় এসে প্রথম সূরা আলাকের ৫ আয়াত নাজিল করে যান। রাসূল (সাঃ) এভাবে তাকে আকাশে দেখে ভীত হলেন এবং ঘরে ফিরে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে চেপে ধর। তারপর সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ১ম ৭টি আয়াত নাজিল হয়। যে আয়াতগুলোতে রাসূল (সাঃ) কে ভবিষ্যতের পুরো দায়িত্ব পালনের জন্যে কি কি প্রাথমিক গুণ অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিলেন। সে প্রাথমিক গুণগুলো হচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ـ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ـ

১। ওহে কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া লোকটি! (যেহেতু রাসূল (সাঃ) কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন উঠ)

২। লোকদেরকে সাবধান কর।

৩। তোমর রবের শ্রেষ্ঠত্ব– ঘোষণা কর।

৪। আর নিজের কাপড় পরিষ্কার রাখ।

৫। আর মলিনতা–পুঁতি–গন্ধময়তা হতে দূরে থাক।

৬। আর অনুগ্রহ করো না বেশী পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭। আর রবের জন্যে ছবর কর।

ব্যাখ্যাঃ আপনাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করতে হলে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। আপনি প্রস্তুত হয়ে পড়ুন, প্রকাশ্যে

www.pathagar.com

নির্ভয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে। আর আপনার প্রধান কাজই হবে লোকদের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে হুশিয়ারী করা। লোকদেরকে পথ দেখাতে হবে যে, কোন পথে চললে ইহকালে ও শান্তি এবং পরকালে বেহেশতে গিয়ে চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করতে পারবে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে চারদিক থেকে মানুষ এমন অশান্তি ভোগ করছিল যে, নিরীহ লোকগুলো সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। নারী জাতির উপর এমন দূর্ব্যবহার করতো যে সভ্রান্ত ঘরের কন্যা সন্তানদেরকে তাদের মা বাবা জ্যান্তই কবর দিয়ে ফেলত- এই জন্যে যে, এর জন্যে সারা জীবন না কেঁদে একদিনেই কেঁদে তার কথা ভুলে যাই। আর চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি তো লেগেই ছিল। তাই আল্লাহ বললেন এরা যে একমাত্র আমার আইন না মেনে চলার কারণেই এত অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছে তা এদের বলে সাবধান করে দাও, এবং বুঝাও যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন মেনে চললে তবেই সমাজে শান্তি আসবে। মানব রচিত আইন মেনে চললে কস্মিন কালেও এমন জুলুম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে থাক। লোকদের বুঝাও যে আল্লাহই সব চাইতে বড় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা এমন যে সারা দুনিয়ার মানুষের এবং সমস্ত রাষ্ট্রের শক্তি একত্রিত করলেও আল্লাহর কাছে এতটুকু মূল্যও এর নেই যতটুকু শক্তি আছে মাকড়সার জালের মধ্যে। এ কথা লোকদের বুঝানোর কাজে লিপ্ত হয়ে যাও। তাকবীর দাও "আল্লাহু আকবার" বলতে থাক (তাহলে আরবের লোক তাদের মাতৃভাষা হিসেবে বুঝবে যে আল্লাহু আকবার এর অর্থ কি)

আর নিজের কাপড় পরিষ্কার রাখার অর্থ শুধু কাপড়ই নয় বরং সেই সাথে তোমাকে সমস্ত প্রকার দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে থাকতে হবে। আর বর্তমান সমাজের প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যেমন ঘৃণ্য চরিত্র দেখতে পাচ্ছ তা থেকে দূরে থাকবে, যে একথা কেউ বলার সুযোগ না পায় যে, এই লোকটা ভাল হওয়ার উপদেশ দেয় কিন্তু তার নিজের মধ্যেই ত্রুটি দেখা যায়। এটা শুধু রাসূল (সাঃ) কে বলা নয়, এটা হচ্ছে ব্যাপক সম্বোধিত বা 'জামি' আয়াত। এর মধ্যে মূলতঃ আমাদের জন্যে শিক্ষা আমরা যারা রাসূল (সাঃ)-এর পরে তারই দায়িত্ব পালন করব। আর বলা হলো কারো প্রতি অনুগ্রহ করে তা লোকদের কাছে বলে বেড়াইও না এবং অনুগ্রহের জন্যে

www.pathagar.com

কাউকে খোটাও দিও না। তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ও আশা করো না। কারণ এসব কাজ সৎ স্বভার অন্তর্ভূক্ত নয়। আর সর্বশেষ বলা হলো যে, যে কাজের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হলো এর জন্যে খুব ধৈর্য ধরতে হবে। যে কোন মুশকিল-মুসিবত দেখে যদি ঘাবড়ে যাও তাহালে তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এই ছবর কত সাংঘাতিক কষ্টসহ্য করার ব্যাপার তা বুঝানোর জন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে তখন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য্যের গুণও বাড়তে থাকবে। যেমন মেশক লোহার হামান দস্তির মধ্যে রেখে লোহার ডাটি দিয়ে যত বেশী পেশা হয় আর মেশক যত বেশী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, তার সুগন্ধ ততো বেশী দূরে ছড়াতে থাকে।" অর্থাৎ বিরোধীদের জুলুম এত বেশী হবে (যদি আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চান) যেন লোহার ডাটি দিয়ে লোহার হামান দস্তির মধ্যে মেশক চূর্ণ করার মত কাফের-মুশরিক ও দুনিয়াদার লোকরা এরূপ ভাবে আপনাদেরকে পিষ্ট করতে থাকে। তবে যদি বে–ছবর হয়ে পিছপা হন তাহলে কিন্তু পরকালে রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে তার রূহানী সন্তানের মর্যাদা লাভ করে বেহেশতে যেতে পারবেন না। তাই বুঝে-সুঝে নিজেকে তৈরী করার জন্যে কথাগুলোর উপর খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে।

দায়িত্ব পালন–২

রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে যা যা স্মরণ রাখা দরকার তার আরো কিছুটা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। রাসূল (সাঃ)-এর উপর যে আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পূর্ব থেকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন সেটা ছিল সূরা মুজ্জাম্মেলের ৫ নং আয়াতের কথাগুলো। যথা আল্লাহ বলেছেন

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

(অর্থাৎ তুমি মনে মনে প্রস্তুতি হও) আমি শীঘ্রই তোমার উপর এক দূর্বহ কথা বা কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করব। এই আয়াত নাজিল হলেই রাসূল (সাঃ) বুঝে ছিলেন যে, আমার উপর আল্লাহ এমন একটা কঠিন দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিবেন যা পালন করা আমার জন্যে খুবই দূর্বহ হয়ে পড়বে। ঠিক তদ্রূপ রাসূল (সাঃ)-এর ন্যায় এ আয়াত থেকে আমাদেরকেও বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহর ভবিষ্যৎ বাণী মুতাবিক রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী

www.pathagar.com

সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের উপরও তেমনই কঠিন দুর্বহ নির্দেশ আসবে, কিন্তু তা আর আল্লাহর নিকট থেকে আসবে না। কারণ এই নির্দেশ তো আল-কুরআনে এসেই রয়েছে। কাজেই সেই নির্দেশ মুতাবিক আমার দলপতি বা আমীরের পক্ষ থেকে যখন যে নির্দেশ আসে তা তেমন ভাবেই পালন করতে হবে যেমন ভাবে পালন করে ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর ছাহাবাদের নিয়ে।

২। যে আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রাসূল (সাঃ) খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহর এ হুকুমের উপর কায়েম থাকতে পারব কি পারব না সেই আয়াতের হুকুম আমাদের উপরেও তেমনি ভাবে বর্তাবে যেমন বর্তেছিল রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের উপর। তা হচ্ছে সূরা হুদের ১১২ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ বলেছেন-

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অতএব হে মুহাম্মাদ (সাঃ) তুমি এবং তোমার সেইসব সাথী যারা (কুফর থেকে ঈমান ও অনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছ তারা ঠিক ঠিক ভাবে সত্য পথের উপরে খুব মজবুত হয়ে দাঁড়াও যেন তোমাদেরকে তোমাদের নীতির উপর থেকে কেউ এক চুল পরিমাণও সরাতে না পারে। যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কখনও (আল্লাহর আনুগত্যের ও দাসত্বের) সীমা লংঘন করো না। তোমরা যা কিছু করছ বা কর তিনি (আল্লাহ) অবশ্য তার উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন।

এ আয়াত নাজিল হলেও রাসূল (সাঃ) খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাকে যে পথে চলতে বলেছেন সেই পথে আমাকে এমন দৃঢ়পথে দাঁড়াতে হবে যেন কোন তাগুতি মতবাদের ঝড় যত জোরে-শোরেই আমার উপর দিয়ে বয়ে যাক না কেন আমি যেন আমার মূলনীতি থেকে এক চুল পরিমাণও সরে না যাই। এ আয়াতে তাদের কথাও যোগ করা হয়েছে যারা পূর্বে কুফরীর নীতির উপর দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারাও যদি ফিরে এসে তোমার (রাসূলের) দলভূক্ত হয় বা তোমার রূহানী সন্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় তবে তাগুতি মতবাদের ঝড় তুফান তাদের উপর দিয়ে যতই বয়ে যাক না কেন তারাও যেন তাদের নীতি থেকে এক চুল পরিমাণও সরে না যায়। আর এ সংগে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, খবরদার সীমা লংঘন করোনা। অর্থাৎ

www.pathagar.com

তোমাদের পার্থিব জীবন-যাপনের জন্যে আল্লাহ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেসব আইন করে দিয়েছেন তার কোন একটিকেও যেন সমাজ থেকে কেউ তুলে দিতে না পারে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন রাজতন্ত্রের মত শক্ত বিদ্‌য়াত যেন ইসলামে না ঢুকতে পারে সে জন্য রাসূলের নাতি যেমন কারবালার মাঠে জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়ে সীমা অতিক্রমের পথকে বেছে নেননি, ঠিক তেমনি ভাবে আজ যেকোন মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যায় (দু'একটা ছাড়া) প্রায় সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্রই আল্লাহর সীমা অতিক্রমের পথকে বেছে নিয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে যারা আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করে শয়তানের পথে চলতে শুরু করেছে। আর এ কাজের হিম্মত যদি আমাদের মধ্যে পয়দা না করতে পারি তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, আমরা রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি নাই।

আল্লাহ সূরা আশ্‌শুরারু ১৫,১৬ ও ১৭ নং আয়াতে বলেছেনঃ

فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۔ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۔ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۔ وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۔ اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۔ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ

"এই জন্যে (অর্থাৎ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে) তুমি এখন সেই দ্বীনের দিকে দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর খুব মজবুতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাক। কিন্তু এই লোকদের (সমাজপতিদের) মনের বাসনার অনুসরণ করো না। (অর্থাৎ তাদের খেয়াল খুশী মুতাবিক তোমাদের যেভাবে যে আইনের মধ্যে তারা চালাতে চাইবে তোমরা সেভাবে চলোনা) তাদের বলে দাও আল্লাহ কিতাব

www.pathagar.com

নাজিল করেছেন–আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করব। সেই আল্লাহই আমাদের এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের জন্যে আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে (অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় যদি আমরা আমল করি তাহলে তোমাদের সাথে আমাদেরকেও দোজখবাসী হতে হবে।) আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া নেই (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট থেকে যখন দলীল প্রমাণ এসেই গেছে তখন এ নিয়ে ঝগড়া কেন করব। এখানে আমার কোন নিজস্ব কথাও টিকবে না তোমাদেরও কোন মনগড়া কথা টিকবে না, টিকবে মাত্র সেটাই যেটা আল্লাহ বলেছেন) আল্লাহ আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এবং তারই কাছে আমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। (তখন বুঝতে পারবে যে, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক ছিল) আল্লাহর দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার পর যেসব লোক আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা নিয়ে ঝগড়া করে তাদের দলীল প্রমাণ আল্লাহর নিকট বাতিল। তাদের উপর তার অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর কঠিন আজাব। তিনিই আল্লাহ যিনি সঠিক, যুক্তিগ্রাহ্য এবং ভারসাম্য পূর্ণ আইন-কানুনসহ কিতাব নাজিল করেছেন। তুমি কি জান, সম্ভবতঃ ফয়সালার দিন নিকটেই এসে গেছে।

এ তিনটি আয়াত দ্বারা আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, আল-কুরআনের কোন আইনই অযৌক্তিক নয় এবং আল-কুরআন কোন ভারসাম্যহীন আইন-কানুন নিয়ে নাজিল হয়নি যার মধ্যে কোন প্রকার দোষত্রুটি কেউ ধরে দিতে পারে। সেই কুরআনের আইনের উপর বা কুরআনী নীতির উপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন। সেই নীতি থেকে এক চুল পরিমাণও যেন কেউ তোমাদের হেলাতে-দুলাতে না পারে। তোমরা এমন লৌহ মানব হয়ে যাও যেন আল্লাহর নীতির উপর থাকার ব্যাপারে সারা পৃথিবীর মানুষ বোঝে যে, মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা আল্লাহর দেয়া আইন থেকে বিন্দু মাত্র সরার মত জাতি নয়। এটা যারা প্রমাণ দিতে পারবে তারাই সত্যিকারের সেই সব লোক যাদের কথা বলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, যে অর্থে তোমার সন্তান দরকার সে কাজ এরাই করবে।

সূরা হামীম আস্‌সাজদা ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

www.pathagar.com

অবশ্য যে সব লোক বলল্ বা মুখ দিয়ে স্বীকার করল যে, আল্লাহই আমাদের রব এবং এই স্বীকারোক্তির উপর তারা অটল থাকল। অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র আইন দাতা ও হুকুম দাতা স্বীকার করার পর যারা এই কথা থেকে একেবারেই সরে দাঁড়ায় না, অর্থাৎ তারা এ কথা মনে করেনা যে আল্লাহকে আইন দাতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার পর আর অন্য কাউকে আইনদাতা ও হুকুমদাতা হিসেবে স্বীকার করা যায়। আর তারা সারাটি জীবন এই স্বীকারোক্তির উপর দৃঢ় ভাবে কায়েম থাকে। তারা এ আকীদাকে এমনভাবে মজবুত করে নেয় যে, তারা স্পষ্ট বোঝে আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই হুকুমদাতা বলে মানা যায় না এবং তা মানলে আর আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা হয় না মুখে কালেমা পড়লেও এতে যে আল্লাহর একাত্ববাদের মধ্যে অন্য প্রভুর প্রভুত্বের সংমিশ্রণ হয়ে যায় তা তারা ভাল করেই বোঝে। তাই তাদের সমাজে যদি আল্লাহ বিরোধী আইন-কানুন দেখে তবে জান–মাল দিয়েও তার বিরুদ্ধে তারা জিহাদে লিপ্ত হয়ে শহীদও হয় কিন্তু আল্লাহর প্রভুত্বের মধ্যে কোন সংমিশ্রণ তারা সহ্য করে না। এমনি তারা মনে করে, যে দ্বায়িত্ব ছিল রাসূলের উপর সে দায়িত্বই এসেছে আমাদের উপর।

তারা সূরা সফ্-এর এবং সূরা তাওবার সেই আয়াতগুলোর খেয়াল করে। আল্লাহ সূরা তওবার ৩৩ নং ও সূরা সফ্ ৯ নং আয়াতে বলেছেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ– তিনি যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন সঠিক পথের সন্ধান এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা সহকারে, যেন তিনি তা সব ধরণের জীবন ব্যবস্থা বা সব ধরণের মতবাদের উপর জয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করবে না।

রাসূল (সাঃ) দায়িত্ব পালন করেছেন একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রামের মাধ্যমে। তাই রাসূলের রূহানী সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদেরও এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে যারা এর বিরোধিতা করে তাদেরকে আল্লাহ এখানে বলেছেন মুশরিক।

www.pathagar.com

অর্থাৎ– তারা অনুগত্য করার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও অন্যান্য কারো হুকুমের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মানে আর কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের আইনও মানে। তাদেরকে আল্লাহ মুশরিক বলেছেন।

এখন প্রশ্ন, আল্লাহ তো আমাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে সব জীবন ব্যবস্থার উপর জয়ী করে দিতে। অর্থাৎ সমাজের যে কেউ যে কোন কাজ করতে হলে আল-কুরআনী আইনের কাছ থেকে অনুমতি চাইতে হবে বা সে কাজ করার কুরআনের অনুমতি আছে কি নেই তা দেখতে হবে। কিন্তু এমন অবস্থা কি আমাদের সমাজে কায়েম আছে?

ধিক আমাদের বুদ্ধির আর আমাদের ঈমানের। আজ পৃথিবীতে যেখানে আমারা সোয়াশো কোটি মুসলমান বাস করি সেখানে দ্বীন ইসলাম রয়েছে "জ্বী হুজুরের' ভূমিকায়। দ্বীন ইসলাম কোন কাজেরই অনুমতি দিতে পারে না। বরং দ্বীন ইসলাম কোন দ্বীনি কাজ করতে চাইলে বাতিলের কাছে হাতজোড় করে বলে যে "ওহে বাতিল হুজুর! আমি একটু দ্বীনি কাজ করতে চাই এর কি অনুমতি হবে? তখন বাতিল যেখানে দেখে যে অনুমতি দিলে তার ক্ষমতায় ধাক্কা লাগতে পারে সেখানে অনুমতি দেয়না।" এই হলো সমাজের বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানদের দায়িত্ব কি তা বুঝে নেয়ার ভার তাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

এরপরও কিছু কথা বাকী থেকে যায় যেটুকুর উল্লেখ না কবলে আমার মনে হয় কথাটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেটা হচ্ছে এই যে, সূরা কাউসারের পরে আর দু'টো সূরা পর পর এসেছে। এ দু'টো কেন সূরা কাউসারের পরেই আনা হলো? দেখুন নাজিল হওয়ার দিক থেকে সূরা কাফেরুন আগে নাজিল হয় তারপর নাজিল হয় সূরা কাউসার। কিন্তু খোদ আল্লাহরই ব্যবস্থাপনায় আগে নাজিল হওয়া সূরাকে আনা হলো পরে। আর পরে নাজিল হওয়া সূরাকে আনা হলো আগে।

এর পরও লক্ষ্যনীয় যে, সূরা কাফেরুন নাজিল হওয়ার প্রায় ১৬/১৭ বছর পরে নাজিল হলো সূরা 'নসর'। এর মধ্যে আরো কত সূরা নাজিল হলো কিন্তু ক্রমিক পর্যায়ে সূরাগুলো সাজানোর বেলায় প্রথমে আনা হলো সূরা কাউসার তার পর আনা হয় কাফেরুন আর মাঝে অনেক সূরা নাজিল হওয়ার পর এক বারে শেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা "নসর" টিকে আনা হলো সূরা কাফেরুনের পরেই। এর মধ্যে আল্লাহর কি হেকমত নিহিত রয়েছে সেটাও একটু চিন্তা করে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) এর দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার সমর্থক যখন ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল এবং কোরেশ কাফেরদের মধ্যে যারা কায়েমী স্বার্থবাদী তারা যখন দেখতে পাচ্ছিল যে, আমাদের পূর্বের ধর্ম যা কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা আর ভুতখানা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। মনে হচ্ছে যেন ভুতখানার ধর্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং রাসূলের ইসলাম যেন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ছে। এতে সমাজে আমাদের যে স্বার্থ কায়েম আছে তা যেন অচিরেই খতম হয়ে যাবে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের যে প্রভূত্ব সমাজে কায়েম ছিল তা যেন আর বেশী দিন টিকবে না। এসব তারা অনুমান করতে পেরে এক আলোচনা সভায় মিলিত হলো। শেষ পর্যন্ত আরবের বড় বড় নেতাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো যে, সমাজের কয়েক জন বড় বড় নেতাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট পাঠাতে হবে। সেখানে গিয়ে প্রস্তাব দিতে হবে যে "কিছু লও, কিছু দাও"।

অর্থাৎ একটা আপোষ মীমাংসা প্রস্তাব দেয়া হোক যে, তার ধর্মেরও কিছু থাক আমাদের কিছু থাক। এভাবে যদি একটা আপোষ করে নেয়া যায় তাহলে হয়ত আমাদের প্রভুত্ব একেবারে খতম হবেনা। তাই তাদের সমাজের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি যথাঃ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, আস্ ইবনে ওয়াইল, ইস্ওয়াদ ইবনে মুত্তালিব এবং উমাইয়া ইবনে খাল্ফ এই চারজনকে পাঠানো হলো রাসূল (সাঃ)-এর নিকট শেষ বারের মত একটা আপোষ প্রস্তাব নিয়ে। তারা গিয়ে প্রস্তাব করল "আপনি আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি যদি মেনে নেন তাহলে আপনার সাথে আমাদের আর কোন দন্দ্ব থাকবে না। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের প্রস্তাব কি?" তারা বললোঃ

১। এক বছর আপনারা আমাদের মা'বুদের (লাত ও উজ্জার) এবাদত করবেন আর এক বছর আপনার মা'বুদের এবাদত করবো। অবশ্য এর পূর্বে তারা আরেকটা প্রস্তাব করেছিল যেঃ

২। "তোমাকে বহু ধনসম্পদ দেব, আরবের সবচাইতে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, তোমার প্রভূত্বও মেনে নেব। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, আমাদের মা'বুদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারবে না। (এর অর্থ শুধু এ নয় যে, ভূতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না। এর অর্থ আমরা যে গোটা সমাজ শিরকী ও কুফরী সমাজ ব্যবস্থা মেনে চলছি যার মধ্যে ভূতের আরাধিনাও রয়েছে, এর কোন কিছুর বিরুদ্ধেই কিছুই বলতে পরবে না। আর

www.pathagar.com

এতটুকু বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের ইসলামের যত কথাই বল না কেন বলে বেড়াও আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের সমাজে এখন একটা দল রয়েছে তারা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কোনই সমালোচনা করে না, তারা মানুষ মা'বুদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না পক্ষান্তরে তারা ইসলামের জন্যে অনেক কিছুই করে থাকে মক্কায় সর্দারদের প্রস্তাবটা এইরূপই ছিল যে, আমরা যেভাবে চলছি এভাবে আমাদের চলতে দাও, এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না। তা না হলে এক বছর করে সবাই সবার ধর্মপালন করি। রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এই ধরনের বহু প্রস্তাব পূর্বে এসেছিল কিন্তু কোনটাতেই রাসূল রাজী হননি। তাই এবার তারা এসেছিল শেষ বারের মত প্রস্তাব নিয়ে।

৩। অথবা তোমার যা খুশি তা বলে বেড়াও কিন্তু সাপ্তাহে একদিন আমাদের সঙ্গে গিয়ে আমরা যেমন ভুতকে চুম্বন করি তেমনি আমাদের সাথে আপনাকে চুম্বন করতে হবে। এতে যদি তুমি রাজী হয়ে যাও তাহলে তোমার সাথে আমাদের আর কোন দ্বন্দ থাকবে না। আমরা সবাই মিলে মিশে বন্ধু ভাবাপন্না হয়ে একত্রে বসবাস করব। তখন তো রাসূল (সাঃ) অবশ্যই জানতেন যে, এদের এ প্রস্তাবের জবাবে কি বলতে হবে। কিন্তু তিনি তার কোন জবাব নিজের থেকে দিলেন না এই জন্যে যে, তিনি ভাবলেন আমি নিজে এর জবাব দিলে পুনরায় আমার নিকট এভাবে প্রস্তাব নিয়ে আসতেই থাকবে। তাই এদের কোন প্রস্তাবেরই জবাব আমি নিজে না দিয়ে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জবাব আসবে সেটা তাদের বলে দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো "আমি আল্লাহর কথার বাইরে নিজের থেকে কিছু বলিও না এবং করিও না।" তাই তোমরা অপেক্ষা কর, দেখ আল্লাহ কি জবাব দেন। তোমাদের প্রস্তাবের জওয়াব আমি দেব না, আমার রবের পক্ষ থেকে এর যে জবাব আসবে সেটাই তোমাদের শুনিয়ে দেয়া হবে। এর পর সূরা কাফেরুন নাজিল হলো। যার ভাবার্থ হলো ইসলাম কোন আপোষ করার মত ধর্ম নয়। গরুর গাড়ীর চাকা যেমন মটর গাড়ীতে ফিট হয় না। গাড়ীটা যদি হয় মোটরগাড়ী তবে তার সব পার্টস পত্র হতে হবে মোটর গাড়ীর। তার চলার পথটাও হতে হবে মোটর গাড়ী চলার মত পাকা রাস্তা। তা না হলে মোটর গাড়ী চলতে পারে না এবং গাড়ীটা যদি হয় রেল গাড়ী তাহলে তার সমস্ত পার্টস হতে হবে রেল গাড়ীর এবং তার রাস্তাটা হতে হবে রেল গাড়ীর রাস্তা। ঠিক তেমনই ইসলাম এমন একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা যার মধ্যে অন্য কোন কিছুই ফিট হয় না। কাজেই কোন আপোষ নেই। এ সূরা নাজিল হওয়ার পরে সব কাফেরই বুঝল যে, কোন আপোষে যখন রাসূল রাজী না, তখন আমাদেরকে আমাদের মা'বুদ আমাদের চলতি সমাজ ব্যবস্থা মেনে যদি চলতে হয় এবং প্রভুত্ব যদি কায়েম রাখতে চাই তাহলে মুসলমানদের সঙ্গে চরম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এবং মুসলমানদের খতম করেই আমাদের টিকে থাকতে হবে। আর মুসলমানরাও বুঝলেন যে, ইসলাম নিয়ে টিকে থাকতে হলে যারা ইসলাম বিরোধী তাদের সঙ্গে চরম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। তাতে হয় মারব, না হয় মরব, কিন্তু পিছ পা হবার কোন অবকাশ নেই। নইলে যদি তাদের সঙ্গে "কিছু দেই কিছু নেই" আপোষে আসি তাহলে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে অশেষ অশান্তি আর পরকালেও ভোগ করতে হবে জাহান্নামের আজাব। তাই উভয় পক্ষ তৈরী হয়ে গেল চরম সংগ্রামে। এ সংগ্রাম চলল বিরামহীন ভাবে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। এরপর যখন ইসামের পূর্ণ বিজয় এসে গেল তখন সূরা নসর নাজিল হলো। বলা হলো, যখন তুমি দেখবে যে পূর্ণ বিজয় এসে গেছে এবং তোমার আর কোন শত্রু নেই মানুষ দলে দলে ইসলামে যোগদান করছে তখন তুমি আল্লাহর তাস্‌বিহ পড়, ক্ষমা চাও তোমার রবের প্রশংসা সহকারে।

এর মধ্যে শিক্ষা হচ্ছে এই যে, যারা রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তান হতে চায় তাদের প্রয়োজন হচ্ছে যখনই দেখবে যে, সমাজ চলছে আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে অর্থাৎ যেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম নেই এবং সমাজে নামাজ–রোজা থাকলেও রাস্তা ঘাটে ইসলাম নেই, অফিস আদালতে ইসলাম নেই, প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইসলাম নেই, বিচার-আচারে ইসলাম নেই, আইন পরিষদে ইসলাম নেই, সমাজব্যবস্থায় ইসলাম নেই, অর্থনীতিতে ইসলাম নেই, শুধুমাত্র মসজিদে, মিলাদ মাহফিলে গোরস্থানের মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে তখন সূরা কাফেরুন নাজিল হলো তখনকার মুসলমানরা যা বুঝেছিল, এখনকার মুসলমানদেরকেও তাই বুঝতে হবে। যদি তারা সত্যিকার অর্থে রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তান হওয়ার ইচ্ছা রাখে। আর ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে যতদিন পর্যন্ত না বিজয়ের পর্যায় আসে। একারণেই সূরা কওসারের পরেই পর পর সূরা কাফেরুন ও সূরা নসর নাজিল করে আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তানদের হুশিয়ার করে দিলেন যে, তোমাদের দায়িত্ব হবে "কিছু লও কিছু দাও" নীতি পরিহার করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণ করার ঘোষণা দিয়ে চরম

www.pathagar.com

সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায়। আর মক্কা বিজয়ের মত অবস্থা যতদিন পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইসলামের আইন-কানুন সমাজের প্রতিটি স্থানে কায়েম না হয় ততদিন পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) ও তার সাহাবীদের ন্যায় তোমরা চরম সংগ্রামে কখনও কোন বিরতি দিবে না। অতঃপর যখন দেখবে যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে, সমাজের কোথাও আর কোন অনইসলামী চাল-চলন নেই, কোন অনইসলামী আইন-কানুনের কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই তখনই তোমাদের বিশ্রাম। এর পূর্বে কোন বিশ্রাম নেই এবং সংগ্রামের কোন বিরতি নেই।

এখন প্রশ্নঃ সংগ্রাম তো করব, কিন্তু একা একা তো কোন সংগ্রাম হয় না। কাজেই কাকে সাথে নিয়ে সংগ্রাম করব? এর জওয়াবে বলতে চাই, আপনি যদি রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তাদের দায়িত্ব পালন করতে আগ্রাহী হন তাহলে সৎ যোগ্য ও ঈমানদার লোকদের নিয়ে একটা জামায়াত গঠন করুন। নইলে দেখুন এ ধরণের কোন সংগ্রামী দল সমাজে কাজ করছে কিনা। যদি আপনার নিরপেক্ষ চোখে এমন কোন দল দেখতে পান তবে সেই দলে ঢুকে পড়ুন।

কিন্তু প্রশ্ন, এর মধ্যে সহজ পন্থা কোনটা। এর জবাবে বলতে চাই ধরুন নদী পার হওয়ার জন্যে নৌকা দরকার। এখন নৌকা যদি না থাকে তাহলে নিজের পার হওয়ার জন্যে এবং যাদেরকে পার করে নেয়ার দরকার মনে করেন তাদেরকে পার করার জন্যে হয় একটা নৌকা তৈরী করে নিতে হবে নইলে দেখতে হবে কোন নৌকা পূর্ব থেকেই কেউ তৈরী করে রেখেছে কিনা। যদি পূর্ব থেকে সামজ দরদী কোন ব্যক্তি নৌকা তৈরী করে রেখে থাকেন তাহলে কেউ আর নৌকা তৈরীর ঝামেলায় যায় না। সেই নৌকাতেই নিজে পার হয় এবং নিজের লোকদেরকেও পার করে নেই। তাই আপনি যদি একমাত্র ইসলামের স্বার্থে নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন তবে আপনার সামনেও তৈরী নৌকা দেখতে পাবেন।

আশা করি, রাসূল (সাঃ)-এর রূহানী সন্তাদের মর্যাদা লাভ করার জন্যে আমাদের চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহর তরফ থেকে যে স্পষ্ট বুঝটা পাব সেই বুঝ মুতাবিক নিজেদের ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থে সেই কাজ করে যাব, যে কাজ করে যাওয়ার ইঙ্গিত আমরা এই নীতিদীর্ঘ আলোচানা থেকে বুঝতে সক্ষম হলাম।

আমিন!

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫